অভিমত

শিক্ষার মান এবং শিক্ষক-রাজনীতি

হরিপদ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় হলো রাজনীতি। এ ব্যবসায় প্রারম্ভিক পুঁজি লাগে না। দরকার শুধু একদল সহচর, যাদের কাজ হবে স্লোগান দেওয়া। মাথা মোটা সহচরের সংখ্যা যতো বেশি হবে, নেতার ব্যবসাও ততো লাভজনক হবে। কেননা, গণতন্ত্র হলো সংখ্যার রাজনীতি। গুণগত মান এ ব্যবসায় ঝুঁকি বাড়ায়। শিক্ষকরা এ কথাগুলো আগেও জানতেন, এখন একটু বেশি জানেন এবং তার চর্চা করেন। এর চর্চাই এখন তাদের সকল দোষের কারণ।

গত ৩ আগস্ট দৈনিক ভোরের কাগজ এবং ৫ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠে প্রায় একই বিষয়ে দুটি তথ্য প্রকাশিত হয়। বিষয়টি হলো, শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণেই শিক্ষার মান বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অপ্রকাশিত রিপোর্টের কিয়দংশ; আর জনকণ্ঠে বেরিয়েছে একটি জরিপ গবেষণার ফলাফলের সারমর্ম।

দুটি রিপোর্টের বক্তব্যই অসার মনে হয়েছে। প্রথম কারণ, রিপোর্ট দুটিতে নতুন কিছু নেই। এ জাতীয় কথা আজ থেকে ১০ বছর আগেও বলা হয়েছে। এটা শুধুই অর্থের অপচয়। শিক্ষার মান যে পড়ে গেছে তার বড়ো প্রমাণ পণ্ডিতদের এ দুটি কাজ। কারণ, তারা নতুন কিছু বলতে পারেননি। চর্বিতচর্বণ।

এ দুটি রিপোর্টের বোকামির কিছু নমুনা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে, যা ভোরের কাগজে প্রকাশিত, শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকাকে দায়ী করা হয়েছে অপরাধ হিসেবে। এর ফলে রিপোর্টের বক্তব্য অনুযায়ী অনেক নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষাঙ্গনে পড়ছে। প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু এজন্য দায়ী কোন ধরনের শিক্ষকরা? মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে প্রায় সব কজন মেম্বার কমিশনে চাকরি পাওয়ার আগে কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। যখন যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে, সে দলের মহান আদর্শে দীক্ষিত শিক্ষকরাই দল করার পুরস্কার হিসেবে কেউ হয়েছেন চেয়ারম্যান, কেউবা সদস্য।

মেধাসম্পন্ন শিক্ষক তথা গুণগত মানের বারটা বাজাবার প্রধান আসামি ঐ শিক্ষকরাই। আজ যারা জ্ঞান দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন, ঠিকমতো ক্লাস নিতেন কিনা, তাদের গবেষণাকর্ম কি, কতো জায়গায় কনসালট্যান্সি করতেন, কতো টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন, প্রফেসর হওয়ার পর কটি প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা থাকাকালীন কটি কমিটির মেম্বার ছিলেন, তাদের লাইব্রেরি কার্ড ছিল কিনা, কতোজন দলের লোককে চাকরি দিয়েছেন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার মধ্যেই নিহিত থাকবে আজকের শিক্ষক রাজনীতির জন্য দায়ী করা, ছাত্রদের কেন শিক্ষকরা ব্যবহার করেন এবং শিক্ষার মান এতো নিম্নগামী কেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই নাকি শিক্ষার মান কমছে এমন অভিযোগ অনেক শোনা যায়। তাহলে কি দেশ স্বাধীন হওয়ার দরকার ছিল না? স্বাধীন হওয়ার পর যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের পড়িয়েছেন কে কিংবা নিয়োগইবা দিয়েছেন কোন সৌরজগতের শিক্ষক?

রাজনীতি করে অনেক কিছু পাওয়া যায়— একথা আজকের শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতিবিরোধী পণ্ডিতগণই শিখিয়েছেন। রাজনীতি না করলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান-মেম্বার হওয়া যায় না, মঞ্জুরি কমিশনে ঢোকা যায় না, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হওয়া যায় না, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা উপ-উপাচার্য হওয়া যায় না, মাদকদ্রব্যের মহাপরিচালকের পদে নিয়োগ লাভ করা যাবে না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হলগুলোর প্রভোস্ট এবং গৃহশিক্ষক হওয়া যায় না, রাজনীতি না করলে সরকারি প্লট পর্যন্তও পাওয়া যায় না।

এগুলো শিখিয়েছেন তারাই যারা এখন সরকারি পদ পেয়ে জ্ঞান দিয়ে বেড়াচ্ছেন পাত্রে-অপাত্রে। ভূতের মুখে রাম নাম মানায় না— আপত্তিটা সেখানেই। ড. খলীকুজ্জামানের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণা ফল যা দৈনিক জনকণ্ঠে গত ৫ আগস্ট প্রকাশিত হয়, তা এক গাদা বস্তাপচা পুরোনো কেচ্ছাকাহিনী। পত্রিকায় প্রকাশিত ফলাফল পাঠ করে মনে হয়েছে, উক্ত গবেষণার উদ্দেশ্যই যেন ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান খারাপ, শিক্ষকরা ক্লাসে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে খামখা বিলম্ব হয়, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এ সকল কথা প্রমাণ করা। উক্ত গবেষণায় মারাত্মক কিছু গোঁজামিল আছে। প্রথমত, এর Sampling size খুবই ছোট। দ্বিতীয়ত, ফলাফল প্রকাশের ভঙ্গি শতকরা হারে absolute figure উল্লেখ করা হয়নি। দুজনের মধ্যে একজন এক কথা বললে শতকরা হারে হয়, শতকরা ৫০ ভাগ উত্তরদাতা। তৃতীয়ত, এ গবেষণায় লাইব্রেরি ব্যবহারের সংজ্ঞা প্রাচীনকালের। গবেষকরা কি জানেন যে, এখন প্রায় প্রতিটি বিভাগে আছে নিজস্ব লাইব্রেরি, আছে ফ্যাকাল্টি লাইব্রেরি। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের ঘরেও আছে ছোটখাটো একখানা লাইব্রেরি। তাছাড়া কম্পিউটার ডাউন-লোড করলে (ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে) পাওয়া যায় বিশ্ব লাইব্রেরি। গবেষক ড. খলীকুজ্জামান কি এসব বিষয়ে খবর নিয়েছেন, নাকি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির ওপর জরিপ চালিয়েছেন? অধ্যাপক-কাম-মহাপরিচালক শিক্ষকদের লাইব্রেরি কার্ড না থাকার যে তথ্য প্রকাশ করে গর্বিত হয়েছেন, সেখানেও একই গলতি পাওয়া যাবে। ১৯৮৭ সালের তথ্য ১৯৯৯ সালে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনিও প্রমাণ করেছেন 'মিষ্টিতেও পিঁপড়া' থাকার প্রবাদটি। ২৮৭ জন শিক্ষকের লাইব্রেরি কার্ড নেই। এর মধ্যে কতোজন প্রফেসর এবং কতোজন সারাদিন রাজনীতি করেন এসব বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করলে ফলাফল আরো আকর্ষণীয় হতো আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লাইব্রেরি কার্ডবিহীন শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ হবে অধ্যাপক, যাদের বর্তমান পেশা হচ্ছে জ্ঞান দিয়ে বেড়ানো, 'রাজনীতি করো না, শিক্ষক। রাজনীতি-শিক্ষার মান খারাপ করেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ তাদের নিজেদের বিরামহীন দলীয় রাজনীতি আজকের শিক্ষাঙ্গনের করুণ অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অনেক নামীদামি গবেষক প্রফেসর, ছিলেন। তাদের উচিত ছিল এ কথাগুলো বলা। শিক্ষার মান কমে গেছে— এটি মূল্যায়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি ধরা হয় শিক্ষকরা কতোটুকু 'ইংরেজি' বলতে এবং লিখতে পারেন।

এটি একটি গোলামি এবং দাসত্বের ঐতিহ্যের মাপকাঠি। পৃথিবীর কয়টি দেশের মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে কিংবা ভালো ইংরেজি জানে? জাপান ইংরেজি না জেনেও পৃথিবীর একটি ঈর্ষণীয় দেশ। ভারতীয়রা ভালো ইংরেজি জেনেও ৫০ বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে ২১২ ডলার থেকে প্রায় ৪০০ ডলার, অন্যদিকে কলম্বিয়ার প্রায় একই সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০০ ডলার থেকে প্রায় ৩ হাজার ডলার, ইংরেজির 'E' না জেনেও। যে গবেষকরা ইংরেজির জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার মান মূল্যায়ন করেন, এদের মাথা থেকে প্রথমে গোলামি চিন্তা সাফ করতে হবে। একদিকে এরা সরকারকে উপদেশ দিয়েছেন সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন করতে, অন্যদিকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল খোলার জন্য গোলামদের পক্ষ হয়ে ওকালতি করছেন।

সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চরিত্র হনন করার জন্য এক শ্রেণীর দালাল বুদ্ধিজীবী পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে আসছে। এদের উপস্থিতি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় স্থানে। চরিত্র হনন করার উদ্দেশ্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বাড়ানো, ছাত্র বাড়লেই মুনাফা। আর মুনাফা বাড়লে তাদের সেলামি— নগদ হোক আর গবেষণা ফর্মেই হোক, বাড়বে। 'রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস' তারই একটি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। পথেঘাটে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, বাড়িতে বাড়িতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বানাবার যে হিড়িক পড়েছে, তার কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যার সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস কিংবা সন্ত্রাস নয় আসল মতলব হচ্ছে, শিক্ষাকে গায়ে-মাখা সাবান বানানো। এ পণ্যের জনপ্রিয়তা বাড়াবোর জন্য বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে সিলেক্ট করা হয়েছে তাদেরই যাদের সমাজে আঁতলামির কারিশমা আছে।

ড. হরিপদ ভট্টাচার্য : অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

SEP. 15 1999